ব্যতিরেকী পদ্ধতি (**<u>Method of Difference</u>**)

আলোচ্য ঘটনাটি উপস্থিত আছে এবং আলোচ্য ঘটনাটি উপস্থিত নেই এমন দুটি দৃষ্টান্তের মধ্যে যদি একটি বিষয় ছাড়া সবকটি বিষয় মিল থাকে এবং যে বিষয়টিতে মিল নেই সেটি প্রথম দৃষ্টান্তে থাকে, তাহলে কেবল যে বিষয়টির জন্য এই দুটি দৃষ্টান্তে পার্থক্য, সেই বিষয়টি আলোচ্য ঘটনার কারণ বা কারণের অংশ। (If an instance, in which the phenomenon under investigation occurs and an instance in which it does not occur, have every circumstances in common save one, that one occurring in the former, the circumstance in which alone the two instances differ, is the effect or the cause, or an indispensable part of the cause of the phenomenon.)।

সহজ কথায় বলা যায়, দুটি দৃষ্টান্তে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এক রকম থাকলেও যদি কোন ঘটনা সরিয়ে নিলে অন্য একটি ঘটনা সরে যায় এবং সেটি উপস্থিত হলে ঐ ঘটনাটি আবার এসে উপস্থিত হয়, তা হলে অনুমান করা যায় যে, ঔই দুটি ঘটনার মধ্যে কারণ-কার্য সম্বন্ধ আছে।

ব্যতিরেকী পদ্ধতির ভিত্তি সূত্র ঃ

১অ) যদি কোনো ক্ষেত্রে এমন হয় যে, ক ঘটেছে কিন্তু খ ঘটে নি তা হলে ক খ-এর কারণ নয়, আবার

১আ) যদি কোন ক্ষেত্রে এমন হয় যে, ক ঘটে নি কিন্তু খ ঘটেছে তাহলে খ ক-এর কার্য নয়;

২) যদি পূর্বগে এমন দুটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, একটি দৃষ্টান্তে ক খ এদের উভয়ই আছে, আর একটিতে ক খ - কোনটিই নেই, অথচ অন্য সব ব্যাপারে দৃষ্টান্ত দুটি অভিন্ন, তাহলে খ ক-এর কার্য, এবং ক খ-এর কারণ (পর্যাপ্ত শর্ত) বা কারণের অপরিহার্য শর্ত।

বলা বাহুল্য (১) বর্জনের সূত্র (২) গ্রহণের সূত্র।

বৈশিষ্ট্য ঃ

১) ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে দৃষ্টান্তের সংখ্যা কেবলমাত্র দুটি।

২) সদর্থক দৃষ্টান্তে কারণ ও কার্য - দুটি ঘটনা উপস্থিত থাকে এবং নঞর্থক দৃষ্টান্তে এই দুটি ঘটনা অনুপস্থিত থাকে।

সদর্থক দৃষ্টান্ত ঃ + A = + a

নঞর্থক দৃষ্টান্ত ঃ - A = - a

অর্থাৎ এখানে সদর্থক দৃষ্টান্তে A এবং a উপস্থিত আছে। এবং নঞর্থক দৃষ্টান্তে A এবং a অনুপস্থিত আছে।

৩) সদর্থক দৃষ্টান্তে দুটি ঘটনার উপস্থিতি এবং নঞর্থক দৃষ্টান্তে দুটি ঘটনার অনুপস্থিতি - এইটুকু পার্থক্য ছাড়া দুটি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত পারিপার্শ্বিক অন্য সব ব্যাপার দুটি দৃষ্টান্তে একই থাকবে।

যেমন ঃ

সদর্থক দৃষ্টান্ত ঃ BC + A = bc + a (A এবং a উপস্থিত)।

নঞর্থক দৃষ্টান্ত ঃ BC – A = bc – a (A এবং a অনুপস্থিত)।

অন্য সব ব্যাপার অর্থাৎ BC এবং bc দুটি দৃষ্টান্তে একই আছে।

৪) দুটি দৃষ্টান্তের এই বিশেষ ধরনের পার্থক্য লক্ষ্য করে দুটি ঘটনার একটিকে অন্যটির কার্য বা কারণ বা কারণের অপরিহার্য অংশ বলা হবে।

৫) ‘ব্যতিরেকী’ কথাটির অর্থ হল পার্থক্য। এই পদ্ধতিতে দুটি দৃষ্টান্তের ব্যতিরেক বা পার্থক্য লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা হয়। তাই এই পদ্ধতিকে ব্যতিরেকী পদ্ধতি বলে।

৬) ব্যতিরেকী পদ্ধতির শর্ত হল ঃ দুটি বিশেষ দৃষ্টান্ত নির্বাচন করতে হবে। এদের মধ্যে দুটি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে।

ক) পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে এই শর্ত পূরণ করা সম্ভব নয়। কেননা, পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র হল প্রকৃতি। প্রাকৃতিক পরিবেশ সর্বদাই পরিবর্তিত হয়। একে নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই পর্যবেক্ষণের সাহায্যে যে দুটি দৃষ্টান্ত নির্বাচন করা হয়, তাদের মধ্যে দুটি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপরিবর্তিত রাখা সম্ভব হয় না। যেমন ঃ

BCD + A ------bcd + a

DEF – A ------ def – a

পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তিত　　পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তিত

খ) পরীক্ষণের ক্ষেত্রে এই শর্ত পূরণ করা সম্ভব। কেননা, পরীক্ষণের ক্ষেত্র হল গবেষণাগার। এখানে কৃত্রিমভাবে পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় এবং এই পরিবেশ আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাই পরীক্ষণের সাহায্যে যে দুটি দৃষ্টান্ত নির্বাচন করা হয়, তাদের মধ্যে দুটি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপরিবর্তিত রাখা সম্ভব হয়। যেমন ঃ

BCD + A ------- bcd + a

BCD – A ------- bcd – a

পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপরিবর্তিত | পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপরিবর্তিত

৭) ব্যতিরেকী পদ্ধতি মূলত পরীক্ষণ পদ্ধতি ঃ
কারণ, একমাত্র পরীক্ষণের সাহায্যেই শর্ত অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ তৈরী করা যায় এবং এই পরিবেশে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপরিবর্তিত রেখে দুটি ঘটনার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি সঠিকভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাই পরীক্ষণমূলক ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগ করে কার্য-কারণ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা হয়, তা নির্ভুল ও নিশ্চিত হয়।

উদাহরণ ঃ

মোমবাতি আছে + আগুন আছে = শীত আছে + আলো আছে।

মোমবাতি আছে + আগুন নেই = শীত আছে + আলো নেই।

এখানে ‘আগুন’ এবং ‘আলো’ - দুটি ঘটনা সদর্থক দৃষ্টান্তে উপস্থিত আছে, কিন্তু নঞর্থক দৃষ্টান্তে অনুপস্থিত আছে, অথচ এদের সঙ্গে যুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ‘মোমবাতি’ এবং ‘শীত’ দুটি দৃষ্টান্তেই অপরিবর্তিত রয়েছে।

সুতরাং আগুন = কারণ।

আলো = কার্য।

এই যুক্তিটিতে পরীক্ষণমূলক ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই এর সিদ্ধান্ত নির্ভুল এবং নিশ্চিত।

আবার ব্যতিরেকী পদ্ধতি পর্যবেক্ষণমূলকও হতে পারে। অর্থাৎ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু এখানে পরিবেশ আমাদের নিয়ন্ত্রনে থাকে না। ফলে, শর্ত অনুযায়ী পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপরিবর্তিত রেখে দুটি ঘটনার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি এখানে সঠিকভাবে লক্ষ্য করা যায় না। তাই পর্যবেক্ষণমূলক ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগ করে কার্য-কারণ সম্পর্কে যে-সিদ্ধান্ত করা হয়, তা সর্বদাই সম্ভাব্য হয়, কখনও নির্ভুল বা নিশ্চিত হতে পারে না।

উদাহরণ ঃ

রাঁধুনি আছে + ভৃত্য আছে = খাওয়া-দাওয়া আছে + চুরি আছে।

ঠিকা ঝি আছে + ভৃত্য নেই = ঘরবাড়ি পরিষ্কার আছে + চুরি নেই।

এখানে ‘ভৃত্য’ এবং ‘চুরি’ - দুটি ঘটনা সদর্থক দৃষ্টান্তে উপস্থিত আছে, কিন্তু নঞর্থক দৃষ্টান্তে উপস্থিত নেই, অথচ এদের সঙ্গে যুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে, সদর্থক দৃষ্টান্তে ভৃত্যের উপস্থিতির সঙ্গে রাঁধুনি উপস্থিত রয়েছে এবং চুরির উপস্থিতির সঙ্গে ‘খাওয়া-দাওয়া’ উপস্থিত রয়েছে। আবার, নঞর্থক দৃষ্টান্তে ভৃত্যের অনুপস্থিতির সঙ্গে রাঁধুনির বদলে ঠিকা ঝি উপস্থিত রয়েছে এবং চুরির অনুপস্থিতির সঙ্গে ‘খাওয়া-দাওয়া’-র বদলে ‘ঘরবাড়ি পরিষ্কার’ উপস্থিত রয়েছে।

সুতরাং ভৃত্য = কারণ।

চুরি = কার্য।

এই যুক্তিটিতে পর্যবেক্ষণমূলক ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই এর সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য।

৮) যে-দুটি বিশেষ দৃষ্টান্ত প্রয়োজন, সেই দুটি দৃষ্টান্ত যদি পরীক্ষণের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়, তাহলে ব্যতিরেকী পদ্ধতির সাহায্যে দুটি ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ভুলভাবে প্রমাণ করা যায়। তাই ব্যতিরেকী পদ্ধতিকে প্রমাণের পদ্ধতি বলা যায়।

সাংকেতিক আকার ঃ কার্য থেকে কারণ বা কারণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ঃ

পূর্ববর্তী ঘটনা (কারণ)	অনুবর্তী ঘটনা (কার্য)	পূর্ববর্তী ঘটনা (কারণ)	অনুবর্তী ঘটনা (কার্য)
DEFG	e	-DEFG	- e
-DEFG	- e	DEFG	e

সুতরাং D হল e-এর কারণ।　　সুতরাং D হল e-এর কারণ।

উক্ত সূত্রে (১অ) প্রয়োগ করে জানা গেল E,F,G e-এর কারণ নয়। কেননা, দেখা যাচ্ছে, একটি ক্ষেত্রে E,F,G ঘটেছে অথচ e ঘটে নি (প্রথম আকারের দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে, দ্বিতীয় আকারের প্রথম দৃষ্টান্তে)।

উক্ত সূত্রে (২) প্রয়োগ করে জানা গেল, সম্ভবত D হল e-এর কারণ।

উক্ত সূত্রে (২) প্রয়োগ করে জানা গেল, সম্ভবত D হল e-এর কারণ।

বাস্তব দৃষ্টান্ত ঃ অমলবাবু প্রায়শই অম্লপিত্ত রোগে ভোগেন। তিনি সন্দেহ করলেন যে, সম্ভবত টক-ডাল খাওয়াই তার অম্লপিত্তের কারণ। এ প্রকল্পের সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য তিনি দুদিন ঠিক এক রকমের খবার খেলেন - তবে একদিন টক-ডাল খেলেন, অন্যদিন খেলেন না। তার দুদিনের খাদ্য তালিকা নিম্নে দেওয়া হল, এবং এ তালিকার ভিত্তিতে, ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগ করে, কী সিদ্ধান্ত করা হল তাও উল্লেখ করা হল। সংক্ষেপকরণের জন্য নিম্নোক্ত সংক্ষেপক প্রতীকগুলি ব্যবহার করা হল। আতপ চালের ভাত = ভ, কলের জল = জ, আলু পটলের তরকারি = প, রুই মাছের ঝোল = র, মুরগীর মাংস = ম

	কী কী খাওয়া হয়েছে	টক-ডাল খাওয়া	কার্য ঃ অম্লপিত্তে ভোগা
১ম দিন ঃ	ভ জ প র ম	হয়েছে	ঘটেছে
২য় দিন ঃ	ভ জ প র ম	হয় নি	ঘটে নি

সুতরাং টক-ডাল খাওয়াই (অমল বাবুর) অম্লপিত্তে ভোগার কারণ।

সূত্রের (১অ) অংশটি প্রয়োগ করে জানা গেছে মুরগীর মাংস, রুই মাছের ঝোল, আলু-পটলের তরকারি ইত্যাদি খাওয়া অম্লপিত্তের কারণ নয়, কেননা দ্বিতীয় দিন এসব খাওয়া সত্ত্বেও অম্লপিত্ত হয় নি। আর (২) অংশটি প্রয়োগ করে বোঝা গেল, টক-ডাল খাওয়াই অম্লপিত্তের কারণ।

সাংকেতিক আকার ঃ কারণ থেকে কার্য বা কার্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ঃ

পূর্ববর্তী ঘটনা (কারণ)	অনুবর্তী ঘটনা (কার্য)	পূর্ববর্তী ঘটনা (কারণ)	অনুবর্তী ঘটনা (কার্য)
D	efgh	-D	-efgh
-D	-efgh	D	efgh

D-এর কার্য হল e ।

উক্ত সূত্রের (১আ) প্রয়োগ করে বোঝা গেল যে, f,g,h D-এর কার্য নয়। কেননা, একটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে D ঘটে নি অথচ f,g,h ঘটেছে (প্রথম আকারের দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে, দ্বিতীয় আকারের প্রথম দৃষ্টান্তে)।

উক্ত সূত্রের (২)প্রয়োগ করে বোঝা গেল, সম্ভবত D-এর কার্য হল e।

বাস্তব দৃষ্টান্ত ঃ

গীতা গরমে খুব কষ্ট পায়। এক (হাতুড়ে) চিকিৎসকের পরামর্শ মত সে ‘তাপঘ্ন’ বলে একটি পাউডার মাখতে শুরু করল, এবং লক্ষ্য করল তার মুখে চুলকানি দেখা দিয়েছে। ও ‘তাপঘ্ন’ ব্যবহার বন্ধ করে দেখল চুলকানি বন্ধ হয়ে গেছে। ও সিদ্ধান্ত করল ‘তাপঘ্ন’ ব্যবহারের ফল (কার্য) হল মুখে চুলকানি। গীতার অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য ও সিদ্ধান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হল। সংক্ষেপকরণের জন্য নিম্নোক্ত সংক্ষেপক প্রতীকগুলি ব্যবহার করা হল।

‘তাপঘ্ন’ ব্যবহার করা =ত, মুখে চুলকানি হওয়া = ম, চোখমুখ জ্বালা করা = চ, দরদর করে মুখ ঘামা = দ, হাতের তালু ঘামা = হ

পূর্বগ (কারণ)	অনুগ (কার্য)
-ত	-ম চ দ হ
ত	ম চ দ হ

সুতরাং ত-এর কার্য হল ম।

[‘তাপঘ্ন’ ব্যবহারের কার্য হল মুখে চুলকানি।]

সূত্রের (১আ) অংশটি প্রয়োগ করে জানা গেল যে, চ, দ, হ এদের কোনটিই ‘তাপঘ্ন’ ব্যবহারের কার্য নয়, কেননা, উক্ত সারণী থেকে দেখা যায়, প্রথম দৃষ্টান্তে ত নেই অথচ চ , দ, হ আছে। সূত্রটির (২) অংশ প্রয়োগ করে বোঝা যায় সম্ভবত ত-এর কার্য ম, ‘তাপঘ্ন’ মাখার ফল চুলকানি।

যুক্তিবিজ্ঞানী মিল ব্যতিরেকী পদ্ধতির যে সাংকেতিক রূপ প্রদর্শন করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

পূর্বগ (কারণ)	অনুগ (কার্য)
ABC	abc
BC	bc

সুতরাং A হল a-এর কার্য বা কারণ বা কারণের অপরিহার্য অংশ।

মিল্ প্রদর্শিত আকারটি আমরা দেখে নিতে পারি। ধরা যাক্ a-এর কারণ নির্ণয় করতে হবে। তাহলে আমরা কার্য a-এর সহগামীগুলি (b,c) অগ্রাহ্য করতে পারি। সেক্ষেত্রে কারণ অনুসন্ধান নিম্নোক্ত রূপ ধারণ করতে পারে।

পূর্বগ (কারণ)	অনুগ (কার্য)
ABC	a
-ABC	-a

সুতরাং A হল a-এর কারণ বা কারণের অপরিহার্য অংশ।

আবার ধরা যাক্ A-এর কার্য নির্ণয় করতে হবে। তাহলে আমরা কারণ, A-এর সহগামীগুলি (B,C) অগ্রাহ্য করতে পারি। সেক্ষেত্রে কার্য-অনুসন্ধান নিম্নোক্তরূপ ধারণ করবে ঃ

পূর্বগ (কারণ)	অনুগ (কার্য)
A	abc
-A	-abc

সুতরাং A-এর কার্য হল a।

ব্যতিরেকী পদ্ধতির সুবিধা ঃ

১) ব্যতিরেকী পদ্ধতি পরীক্ষণমূলক। সুতরাং এই পদ্ধতিতে কার্য-কারণ সম্পর্ক পরীক্ষণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত বলে ব্যতিরেকী পদ্ধতি থেকে পাওয়া সিদ্ধান্ত অন্বয়ী পদ্ধতি থেকে পাওয়া সিদ্ধান্ত থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী সম্ভাব্য বা বলা যেতে পারে প্রায় সুনিশ্চিত। (পুরো নিশ্চিত বলা যায় না এজন্য যে আরোহ অনুমান কখনই সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তা দিতে পারে না।) এই কারণে যুক্তবিদ্ মিল-এর কাছে ব্যতিরেকী পদ্ধতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

২) অন্বয়ী পদ্ধতি দিয়ে যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়, ব্যতিরেকী পদ্ধতির সাহায্যে সেটি প্রমাণিত হয়।

৩) এখানে যেহেতু খুব কম সংখ্যক দৃষ্টান্ত নেওয়া হয়, কোন দুটি মাত্র দৃষ্টান্তের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত টানা হয়, তাই ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে অনেক কম জটিলতা থাকে এবং সময় সংক্ষেপ হওয়াতে দ্রুত কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রমাণ করা যায়।

৪) ব্যতিরেকী পদ্ধতির সাহায্যেও কার্য থেকে কারণ এবং কারণ থেকে কার্য উভয়ই অনুমান করা যায়। একারণে এই পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্র বেশ ব্যাপক।

৫) যেখানে পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয় না, সেখানে ব্যতিরেকী পদ্ধতি কার্য-কারণ নির্ণয়ে সাহায্য করে।

৬) ব্যতিরেকী পদ্ধতির সাহায্যেও আমরা যা কারণ নয়, তা অপসারণ করতে পারি যেহেতু এই পদ্ধতিও অপসারণ সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যখন কারণ থেকে কার্য নির্ণয় করা হয় তখন যে অংশগুলি কারণ নয়, সেগুলিকে ব্যতিরেকী পদ্ধতি নির্ভুল, সুনিশ্চিতভাবে অপসারণ করতে পারে অপসারণ সূত্রের সাহায্যে। অপসারণের যে সূত্রটির ওপর নির্ভর করে অ-কারণ (বা কারণ নয়) বাদ দেওয়া হয় তা হল - যদি A ঘটে B না ঘটে তাহলে A, B-এর কারণ নয়।

সুতরাং ব্যতিরেকী পদ্ধতি অ-কারণকে নির্ভুলভাবে বাদ দিতে পারে।

৭) বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে কোনো তত্ত্ব প্রমাণের জন্য ব্যতিরেকী পদ্ধতি খুবই কার্যকরী। মস্তিষ্কের ‘হাইপোথ্যালামাস’ অংশটি ‘দেহের ভারসাম্য’ রক্ষা করে। এই অংশটি প্রমাণ করার জন্য একটি দৃষ্টান্তে ‘হাইপোথ্যালামাস’ অংশটি রাখা হল, দেখা গেল ভারসাম্য আছে। আবার ঐ অংশটি বাদ দেওয়া হল, সাথে সাথে দেহের ভারসাম্যও নষ্ট হয়ে গেল। সুতরাং ‘হাইপোথ্যালামাস’ ও ‘শরীরের ভারসাম্যে’র মধ্যে একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে এটি প্রায় নিশ্চিত হল। এইভাবে ব্যতিরেকী পদ্ধতি যে কোন তথ্য প্রমাণে সহায়তা করে।

যুক্তিতে ব্যতিরেকী পদ্ধতির প্রয়োগ ঃ

থাইরয়েড গ্রন্থি বাদ দিলে বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়। সুতরাং থাইরয়েড গ্রন্থিই বুদ্ধির কারণ।

যুক্তি বিশ্লেষণ ঃ

থাইরয়েড গ্রন্থি আছে = বুদ্ধি স্বাভাবিক আছে।

থাইরয়েড গ্রন্থি বাদ = স্বাভাবিক বুদ্ধি নেই।

সুতরাং থাইরয়েড গ্রন্থি = কারণ।

বুদ্ধি = কার্য।

উক্ত যুক্তিতে ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। এখানে ‘থাইরয়েড গ্রন্থি’ এবং ‘বুদ্ধি’ (স্বাভাবিক বুদ্ধি) - দুটি ঘটনা সদর্থক দৃষ্টান্তে একই সঙ্গে উপস্থিত আছে। এবং নঞর্থক দৃষ্টান্তে একই সঙ্গে অনুপস্থিত আছে। এইভাবে উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে এখানে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, ‘থাইরয়েড গ্রন্থি’ এবং ‘বুদ্ধি’ (স্বাভাবিক বুদ্ধি) - দুটি ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে।

বিচার ঃ এই যুক্তিতে পরীক্ষণের সাহায্যে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। তাই এখানে সিদ্ধান্ত নিশ্চিত।

ব্যতিরেকী পদ্ধতির সীমা(Limitations of method of Difference)

১) ব্যতিরেকী পদ্ধতি মূলত পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না। তবে পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি যদি অসতর্কভাবে প্রয়োগ করা হয় তা হলে কাকতালীয় দোষ(Fallacy of post hoc ergo propter hoc) ঘটতে পারে। এই পদ্ধতির সাহায্যে যদি দুটি ঘটনাকে এভাবে দেখা হয় - একটি ঘটনা ঘটে নি, অপর ঘটনাটিও ঘটে নি। যেই একটি ঘটনা ঘটল, অমনি অপর ঘটনাটিও ঘটল। সুতরাং প্রথম ঘটনাটি দ্বিতীয় ঘটনার কারণ। তাহলে যে কোন পূর্ববর্তী ঘটনাকে কারণ বলতে হবে। ফলে কারণের অপরিবর্তনীয় গুণটি আর থাকবে না। একেই বলা হয় কাকতালীয় দোষ। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টির সহজ অনুধাবন করা যেতে পারে।

গাছে কাক ছিল, গাছে তাল ছিল। কাক উড়ে গেল, তালটিও পড়ে গেল। সুতরাং কাক উড়ে যাওয়াই তাল পড়ার কারণ।

২) অপসারণের সূত্রের সাহায্যে এখানে অ-কারণকে নিশ্চিতভাবে অপসারণ করা গেলেও অ-কার্যকে নিশ্চিতভাবে অপসারণ করা যায় না। অন্বয়ী পদ্ধতি যা কারণ নয়, আবার যা কার্য নয় - এরকম দু-প্রকার ঘটনাই অপসারণ করতে পারে। কিন্তু ব্যতিরেকী পদ্ধতি যা কারণ নয় - তা অপসারণ করতে পারলেও যা কার্য নয় তাকে সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করতে পারে না। আর যেহেতু অ-কার্যকে নিশ্চিতভাবে বা নিঃসন্দিগ্ধভাবে অপসারণ করতে পারে না, ফলে নির্ভুলভাবে কার্যও নির্ণয় করতে পারে না। তাছাড়া অকারণকে অপসারণ করতে পারলেও ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে নিঃসন্দিগ্ধভাবে কারণ আবিষ্কার ও প্রমাণ করতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ পেনের কালি লিক করার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে রবার টিউব ফেটে যাওয়াই প্রাসঙ্গিক ঘটনা হতে পারে। কিন্তু পেন দুটি একই রঙের, একই দোকান, একই মডেল ইত্যাদি বিষয়গুলি সব অপ্রাসঙ্গিক। তাই কার্য বা কারণ নির্ণয় করতে গেলে কোন্ ঘটনা প্রাসঙ্গিক আর কোন্ ঘটনা অপ্রাসঙ্গিক, তার একটি পূর্ণ কল্পনা বা প্রাক্-কল্পনা থাকা দরকার। অতএব ব্যতিরেকী পদ্ধতিও অন্বয়ী পদ্ধতির মতোই প্রাক কল্পনা থাকা দরকার।

৪) ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রমাণেরর পদ্ধতিও নয়। এখানে দুটি দৃষ্টান্তে একটি মাত্র ঘটনার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত করা হয়। অর্থাৎ দুটি দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি মাত্র ঘটনার পার্থক্যের ওপর এই পদ্ধতি নির্ভর করে।

একটিমাত্র ঘটনা বা বিষয় (factor) বলে যাকে ভাবা হচ্ছে তা কী সত্যই একটিমাত্র ঘটনা নাকি একটি জটিল ঘটনার সমষ্টি। ব্যতিরেকী পদ্ধতি এ কথা প্রমাণ করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত ঃ নির্দিষ্ট দুটি ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ প্রমাণ করলেও ব্যতিরেকী পদ্ধতি সঠিকভাবে এই সম্বন্ধ প্রমাণ করতে পারে না। ধরা যাক্ , আমি একদিন দুপুরে অন্যান্য খাবাবের সঙ্গে চিংড়ি মাছ খেলাম, আমার পেটের ব্যথা হল। পরের দিন আমি ঐ একই খাবার খেলাম, কিন্তু চিংড়ি মাছ খেলাম না, আমার পেটের ব্যথা হল না। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত করলাম চিংড়ি মাছ খাওয়াই পেট ব্যথার কারণ। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সার্বিক নয়। কেবলমাত্র দুটি দিনের দৃষ্টান্ত দেখে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক নয়। এমন হতে পারে ফুচকা খাওয়ার জন্য বেশ কয়েক দিন ধরে পেটটা খারাপ ছিল, এবং যেদিন চিংড়ি মাছ খেয়েছিলাম, সেদিন পর্যন্ত পেটটা খারাপ ছিল, তারপর থেকে পেট ভালো হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং চিংড়ি মাছ খাওয়ার সঙ্গে পেট খারাপের সম্বন্ধ থাকতে পারে না। তাছাড়া যদি ধরে নেওয়া হয় যে চিংড়ি মাছ খাওয়াই পেট খারাপের কারণ তাহলেও এর ওপর নির্ভর করে একটি সামান্য বচন করা যাবে না। অর্থাৎ বলা যাবে না যে সব ক্ষেত্রেই চিংড়ি মাছ খাওয়াই পেট ব্যথার কারণ। এই জন্যই বলা হয় ব্যতিরেকী পদ্ধতি কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রমাণ করতে পারে না।

ব্যতিরেকী পদ্ধতির গুরুত্ব বা মূল্য ঃ

এই পদ্ধতি যেহেতু মূলত পরীক্ষণের ওপর ভিত্তি করে, সে হেতু অন্বয়ী পদ্ধতির সিদ্ধান্ত থেকে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দান করে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া দৈনন্দিন জীবনে প্রায়শঃই এই পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়। উপরন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে ব্যতিরেকী পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য বলে এই পদ্ধতির সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আর যে হেতু অ-কারণকে এই পদ্ধতি নির্ভুলভাবে অপসারণ করতে পারে তাই সেই নেতিবাচক কাজটির দিক থেকেই এই পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। যদিও ইতিবাচক দিক থেকে কারণকে নির্ভুলভাবে প্রমাণ করতে পারে না।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ